بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৫ মে ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টস্থ বাইতুস্ সুবুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৫ মে ২০১২-এর (২৫ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এক স্থানে বলেন, **'আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি আমাকে একটি নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত জামাত দিয়েছেন। আমি লক্ষ্য করেছি, যে কাজের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের আহবান করি তারা তাৎক্ষণিকভাবে পরম আন্তরিকতার সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে নিজ শক্তি সামর্থ অনুসারে এগিয়ে আসেন। আমি দেখছি তাদের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা রয়েছে। আমার পক্ষ থেকে যে কোন নির্দেশ আসে আর তারা তাৎক্ষণিকভাবে তা পালনে তৎপর'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, **'প্রকৃত অর্থে কোন জাতি বা জামাত গঠিত হওয়া সম্ভব নয় যদি তাদের মাঝে স্বীয় ইমামের আনুগত্য ও তাঁকে অনুসরণের এমন উদ্দীপন, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার বৈশিষ্ট্য না থাকবে'**। তিনি (আ.) আরো বলেন, **'হযরত মসীহ (আ.)-কে অনেক কঠিন অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর কষ্টের কারণ গুলোর মধ্যে তাঁর জামাতের দুর্বলতা এবং অবহেলাও ছিল** (অর্থাৎ ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলছেন) **পক্ষান্তরে মহানবী (সা.)-এর সাহাবারা (রা.) বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার এমন নমুনা দেখিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। তারা তাঁর (সা.) জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাকে অতি সহজ ভাবে নিয়েছেন। এমন কি তারা নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে গেছেন। নিজেদের সহায়-সম্পদ, উপায়-উপকরণ ও স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা তাঁর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই সততা ও বিশ্বস্তাই অবশেষে তাদেরকে সাফল্য মন্ডিত করেছিল। অনুরূপভাবে আমি দেখছি আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকে এর মান ও অবস্থানের নিরিখে এরূপ এক আন্তরিকতা দান করেছেন যে, তারা বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন'**।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর হকীকাতুল ওহী গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনের উল্লেখ করতে গিয়ে ৭৬তম নিদর্শনে বলেন, **'বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যৎবাণী আছে, "আল কায়তো আলাইকা মুহাব্বাতাম্ মিন্নি ওয়া লিতাসনায়া আলা আইনী" অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, "আমি মানব হৃদয়ে তোমার ভালবাসা সঞ্চার করব এবং আমি আমার চোখের সামনে তোমায় লালন-পালন করব।" এটি সে যুগের ইলহাম যখন একজনও আমার সাথে সম্পর্ক রাখত না। এরপর এক দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই ইলহাম পূর্ণতা পেল। খোদা তা'লা হাজার হাজার এমন মানুষ সৃষ্টি করলেন যাদের অন্তরকে তিনি আমার ভালবাসায় সমৃদ্ধ করেছেন। কেউ কেউ আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কেউ কেউ আমার খাতিরে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার শিকার হয়েছে। অনেকেই আমার খাতিরে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার এমন মানুষও আছেন যারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন অগ্রাহ্য করে আমাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের সম্পদ আমার হাতে তুলে দেন'**। এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন নিবেদিত প্রাণ সাহাবী হযরত সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেব ওভারশিয়ারের এক পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, **"আমার প্রবল বাসনা হলো, কিয়ামত দিবসে হুযূরের ছায়ায় তাঁর কল্যাণ মন্ডিত জামাতের সদস্যদের অর্ন্তভূক্ত হওয়া, যেমনটি কিনা এখন আছি। মহাসম্মানিত হুযূর! আল্লাহ্ জানেন, বহুগুণের সমাহার আপনার পবিত্র সত্তার জন্য আমার অন্তরে এত ভালবাসা রয়েছে যে, আমার সমস্ত সম্পদ ও প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত, আমার হাজার প্রাণ আপনার জন্য কুরবান (হতে প্রস্তুত)। আমার ভাই আমার মা-বাবা আপনার জন্য নিবেদিত! আল্লাহ্ তা'লা আপনার ভালবাসা ও আনুগত্যের মাঝে আমার জীবনের অবসান ঘটান"**, (আমীন)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যখন আমি আমার জামাতের বেশীরভাগ সদস্যের মাঝে এমন নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখি তখন আমার মন নির্দ্বিধায় বলে উঠে, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অনু-পরমানু তোমার নিয়ন্ত্রণে, এমন দুর্যোগপূর্ণ যুগেও তুমি তাদের হৃদয়গুলোকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছ এবং তাদেরকে তুমি দৃঢ়তা দান করেছ, এটি তোমার ক্ষমতার এক মহা নিদর্শন'**।

এখন আমি এমন কতক নিষ্ঠাবান সাহাবীর রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী উল্লেখ করব যারা বিশ্বস্ততা, ভক্তি-ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। বাহ্যতঃ কিছু বিষয় সাধারণ বলে মনে হয়, অনেক ছোট-খাট বিষয় রয়েছে, মানুষ মনে করে এ আবার কেমন আনুগত্য, এটি তো একটি সাধারণ বিষয় কিন্তু আনুগত্যের প্রতিটি (এমন) ঘটনায় সুগভীর শিক্ষা অন্তর্নিহিত রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার কল্যাণে তারা যে কত আন্তরিকতার সাথে তাঁর আনুগত্য করতেন (তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না)! এসব বিষয় আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আসলে এগুলোই প্রকৃত আনুগত্য ও সুসম্পর্ক যা পরবর্তীতে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রেও উন্নতির কারণ হয় এবং জামাতের ঐক্য ও উন্নতির কারণ হয়।

অবসর প্রাপ্ত পোষ্টম্যান হযরত ফযলে ইলাহী সাহেব (রা.) বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আমার পদোন্নতির আদেশ জারী হলে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলি, 'হুযূর আমার পদোন্নতি হয়েছে, এখন আমি এখান থেকে চলে যাব, কেননা এখন আমার বদলি হয়ে যাবে। হুযূর বললেন, দেখ ফযলে ইলাহী! এখানে মানুষ হাজার হাজার রূপী খরচ করে আসছে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) আর তুমি পদোন্নতির জন্য এখান থেকে চলে যাবে? তুমি এখানেই থাক, আমি তোমার

ক্ষতি পুষিয়ে দিব। তিনি বলেন, হুযূরের কথা মতো আমি যেতে অস্বীকার করলাম এবং সেখানেই রয়ে গেলাম আর আর্থিক লাভের বিষয়টিও জলাঞ্জলি দিলাম।

হযরত মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মামলায় হাজিরা দেবার জন্য গুরুদাসপুর যেতেন আর আমাকে তিনি তাঁর সাথে আর্দালী হিসেবে রাখতেন। সে যুগে এক্কা (টমটম বা ঘোড়ার গাড়ি) গাড়ির প্রচলন ছিল। হুযূর (আ.) সকালে যখন যাত্রার উদ্দেশ্যে বের হতেন তখন বলতেন, মিয়াঁ ফযলুর রহমান কোথায়! আমি উপস্থিত থাকলে উত্তর দিতাম, আর না থাকলে বাড়িতে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে পাঠাতেন, তাড়াতাড়ি আস! হুযূরের এক্কা সর্বদা আমিই চালাতাম। এক্কা চালকের এক্কা চালানোর অনুমতি ছিল না। আমি এক্কার চালকের আসনে বসতাম এবং মরহুম মিয়াঁ শাদী খাঁন সাহেব আমার সাথে সামনে বসতেন আর এক্কাতে হুযূর (আ.) একা বসতেন। তখন (অর্থাৎ এই মামলা চলাকালে) আমার দ্বিতীয় সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার টাইফয়েড হয়। অধিকাংশ সময়ই হুযূর (আ.) ওকে দেখতে আসতেন। মামলার তারিখের একদিন পূর্বে আমার স্ত্রী আমাকে বলল, হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য লিখুন। আমি বললাম, হুযূর যখন প্রতিদিনই তাকে দেখতে আসেন তখন আর লেখার দরকার কি? কিন্তু তিনি জোর দেন— ফলে আমি একটি দোয়ার আবেদনপত্র লিখে দেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাতে লিখে দেন, দোয়া করব কিন্তু তকদীরে মুবরাম (অর্থাৎ অটল তকদীর) হলে বিপদ টলবে না। এ কথা পড়ে আমার চোখে অশ্রু নেমে আসে। আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করল, চোখে পানি কেন? আমি বললাম, এ সন্তান এখন আর আমাদের কাছে থাকতে পারে না। সে যদি সুস্থ হতো তবে তিনি (আ.) এ কথা লিখতেন না। যাহোক পরবর্তী দিন সকালে রওয়ানা হবার কথা ছিল, সব লোক চত্তরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, হুযূর বের হয়ে আর কারো সাথে কোন কথাবার্তা না বলে সোজা আমার বাড়ি আসেন— ছেলেকে দেখেন, ওকে দম করেন এবং আমাকে বলেন, আজ তুমি এখানেই থাক আমি কাল চলে আসব, ছেলের অবস্থা খুব খারাপ ছিল তাই আমি রয়ে গেলাম। এদিন ব্যতীত বাকী সব ক'টি সফরে হুযূর (আ.)-এর সাথে গিয়েছিলাম। সন্তানের জন্য মর্ম যাতনার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু একদিন সাথে যেতে না পারার যে দুঃখ তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল।

মৌলভী নিযামুদ্দীন সাহেবের ছেলে হাফিয আব্দুল আলী সাহেব (রা.) বলেন অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল (রা.) তাকে বলেছেন, তিনি যখন লাহোর মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য আসেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেছেন তুমি লাহোরের বাসায় একা থাকবে না বরং নিজের সাথে অবশ্যই কাউকে রেখো। হুযূর (আ.)-এর এ নির্দেশের কারণে আমি দেখেছি হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব কোন শহরে একা থাকতেন না। সে সময় মেডিকেল কলেজের কোন ছাত্রাবাস ছিল না। মীর সাহেব বাসা ভাড়া করে থাকতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হুযূর (আ.)-এর এ নির্দেশকে বিচ্ছিন্ন নির্দেশ মনে করেন নি, বরং সারা জীবন যেখানেই থাকতেন কাউকে না কাউকে সাথে রাখতেন।

আমীর বখ্শ সাহেবের ছেলে হযরত মালেক শাদী খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার মরহুম মিয়াঁ জামালউদ্দিন এর সাথে কাদিয়ান গেলাম। আমরা যোহরের সময় মসজিদে মুবারক এ পৌঁছাই। হযরত সাহেব নামায পড়াতে মসজিদে আসলে আমি তাঁর (আ.)-এর সাথে করমর্দন করি। আমার কানে ছোট ছোট দুল ছিল। হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করলেন কানে এই দুল কেন। মুসলমানরা তো এগুলো পরে না। জামালউদ্দিন সাহেব বললেন, হুযূর গ্রামের লোকেরা

এমনই হয়ে থাকে, এমন বিষয় সম্পর্কে তারা অজ্ঞ হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বললেন, তার কান থেকে দুল গুলি খুলে ফেল। মীর নাসের নওয়াব সাহেব বললেন তাড়াতাড়ি খুলে ফেলো, কেননা হযরত সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (আ.) যখন আসরের নামাযে আসলেন আমাকে দেখে বললেন এখন মুসলমান বলে মনে হয়। এরপর আমি বয়আত করি, এর পূর্বে তিনি বয়আত করেন নি।

ইদানিং কতক ছেলে ফ্যাশন করতে গিয়ে উদ্ভট ও বাজে জিনিস পরিধান করে, কেউবা গলায় সোনার চেইন পরে। এসব কিছু নিষিদ্ধ, পুরুষদের জন্য সোনা পরিধান করা নিষেধ। অনেক সময়ে পরিবেশের প্রভাব পড়ে, যার ফলে আমি আহমদী ছেলেদেরও এ ধরনের ফ্যাশন করতে দেখেছি।

আব্দুর রহমান সাহেব ভাট্টির মেয়ে যিনি বশীর আহমদ ভাট্টি সাহেবের মাতা– বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার নিজ বাসায় একটু পোলাও রান্না করান। হুযূর (আ.)-এর নির্দেশে হযরত উম্মুল মু'মিনীন কাদিয়ানের প্রতিটি আহমদী ঘরে অল্প অল্প করে পোলাও পাঠান। এ পোলাও বরকতের (কল্যাণের) পোলাও বলে প্রসিদ্ধ। হুযূর (আ.)-এর নির্দেশ ছিল ঘরের প্রতিটি সদস্যকে এ পোলাও খাওয়াবে। অতএব জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেব তার বড় ছেলে আব্দুর রহীমকে (বশীর আহমদের পিতা) যিনি জম্মুতে চাকুরিরত ছিলেন খামে করে কয়েকটি পোলাও পাঠিয়ে দেন, কেননা হুযূর (আ.)-এর নিদের্শ ছিল ঘরের প্রতিটি সদস্য যেন এ পোলাও খায়। হুযূর (আ.)-এর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তার সন্তান যে কাদিয়ানে উপস্থিত ছিল না তাকেও খামে করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পত্রে লিখে দিয়েছেন কাগজের এই কোনায় পোলাও আছে তা খেয়ে নাও। একেই বলে সত্যিকার ভালবাসা ও আনুগত্য।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল গাফফার সাহেব জাররাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.) যখন শেষ বারের মত লাহোরে আসেন তখন চিঠি লিখে আমার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। পিতা মহোদয় যখন লাহোরে পৌঁছান তখন খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব বললেন, মিয়াঁ গোলাম রসূল! তুমি আমাদের এখানে কী করছ? অর্থাৎ তোমার আগমনের হেতু কী? পিতা মহোদয় হযরত সাহেবের পত্র বের করে দেখালেন এবং বললেন, এই ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস কর যিনি আমাকে ডেকেছেন। এরপর হুযূরের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং হুযূরের চুল ছাঁটলেন, মেহেদি লাগালেন আর খাজা সাহেবের কথার উল্লেখও করলেন। হযরত সাহেব একটি চিরকুট লিখে দিলেন তা নিয়ে পিতা মহোদয় নিচে গিয়ে দেখালেন এতে সবাই নিরব হয়ে গেল কেউ কোন কথা বলল না। শুধু তাই নয় হুযূর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আমার পিতা মহোদয়কে পাঁচ রূপী দিলেন এবং বললেন, আপনাকে আমি ডেকেছি, আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। সাহাবাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসার আচরণ এমনই ছিল। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর চেয়েও বেশী স্নেহ ও ভালবাসা রাখতেন।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হাফিয সাহেব যখন কাদিয়ান এসেছিলেন তখন তিনি অনেক বেশী হুক্কা পান করতেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে মিয়াঁ নিযামুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে গিয়ে পান করতেন। এরা (নিযামুদ্দীন) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয় কিন্তু ঘোর বিরোধী ছিলেন। হযরত সাহেব হুক্কা পান করার বিষয়টি জেনে গেলেন। তিনি বললেন, মিয়াঁ হামেদ আলী! এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে হুক্কা কিনে নিয়ে আস এবং যখন প্রয়োজন পড়বে ঘরেই পান কর। এদের কাছে যেও না কেননা এরা ইসলামেরই ধার ধারে না। অতএব তিনি হুক্কা

কিনে পান করতে থাকেন আর অন্যান্য অতিথিরাও সেই হুক্কা পান করত। ছয় সাত মাস পর হযরত সাহেব বললেন, মিয়াঁ হামেদ আলী! যদি হুক্কা ছেড়ে দিতে তাহলে কত ভাল হত? হাফিয সাহেব বললেন, বেশ হুযূর তাই হবে। তিনি তখনই হুক্কা পান করা ছেড়ে দিলেন। (অসৎ সঙ্গ থেকে মুক্ত করানোর জন্য সাময়িক সমাধান হিসাবে অস্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, যাও নিজের হুক্কা নিয়ে আস এবং ঘরে পান কর আর কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর বললেন, যেহেতু এটি এমন জিনিস যা স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর আর বদভ্যাসে লিপ্ত করে তাই এটি যদি ছেড়ে দাও তাহলে ভাল। এ ঘটনা থেকে কেউ যেন এমন ধারণা না করে, যেহেতু একবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাই এটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। ধুমপান এবং এ জাতীয় যেসব জিনিস রয়েছে এগুলো এমন কুঅভ্যাস যা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, **'যদি মহানবী (সা.)-এর যুগে এগুলো অর্থাৎ তামাক প্রভৃতি থাকতো তাহলে তিনি (সা.) এর ব্যবহার নিষেধ করতেন'**।

হযরত মালেক গোলাম হোসেন সাহেব মুহাজের (রা.) বর্ণনা করেন, একবার (জনৈক শেঠ সাহেব ছিলেন তার উল্লেখ করে বলেন) তিনি আসলে হযরত আকদাস আমাকে ডেকে বললেন, মিয়াঁ গোলাম হোসেন! শেঠ সাহেবের সেবার জন্য পিরাঁ এবং মিয়াঁ করম দাদ'কে আমি নিযুক্ত করেছি ঠিকই কিন্তু তারা খুবই সহজ-সরল মানুষ তাই আপনিও তাঁর দেখাশুনা করুন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে আনার দায়িত্ব ছিল পিরা'র। আর তিনি যেহেতু তামাক সেবন করতেন করম দাদ তার জন্য হুক্কা সাজিয়ে দিত। হুযূর আমাকে এই দু'জনের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করে বলেন, তুমিও তার (অর্থাৎ শেঠ সাহেবের) খেয়াল রাখবে। খুবই সম্মানিত মানুষ আর অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে আসেন। শেঠ সাহেব আমাকে বলতেন, মিয়াঁ গোলাম হোসেন! আমি দৌড়ে গিয়ে বড় মসজিদ হতে তাজা পানি নিয়ে আসতাম, তার খাবারও ঘর হতে (মসীহ্ মওউদ এর ঘর) রান্না হয়ে আসতো। আমিই তাকে খাবার পরিবেশন করতাম। তিনি একনাগাড়ে প্রায় এক থেকে দেড় মাস পর্যন্ত থাকতেন। হযরত সাহেব কখনো কখনো খাকসারের কাছে জিজ্ঞেসও করতেন, শেঠ সাহেবের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? মসজিদে একবার হযরত সাহেব মুচকি হেসে শেঠ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, শেঠ সাহেব! আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে না তো? তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! কোন সমস্যা হচ্ছে না, মিয়াঁ গোলাম হোসেন তো পানিও মসজিদ থেকে এনে দেয়। হযরত সাহেব শেঠ সাহেবকে বিদায় দেয়ার জন্য দারুস্ সেহেত পর্যন্ত যেতেন। আর যখন হযরত সাহেব ফেরত আসতেন তখন আমাকে, পিরাঁ দিত্তা ও করম দাদ'কে ডেকে তাদের দু'জনকে দুই রূপি করে বখশিশ দিতেন আর আমাকে পাঁচ রূপি বখশিশ দিতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশে অতিথিদের সেবা, সম্মান ও আতিথিয়েতা সবাই করতেন। এমনিতেই আতিথেয়তার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু এখানে আর একটি মাত্রা যুক্ত হল, প্রধাণতঃ সেবার সওয়াব লাভের জন্য আর দ্বিতীয়টি ভালবাসা এবং আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য।

হযরত মৌলভী আযীয দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) যিনি সে সময় লাহোরে চাকরী করতেন— হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট সকালে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন। হযরত সাহেব বললেন, আপনি যাবেন না, আজকে এখানেই থাকুন। এরপর মুফতী সাহেব দুপুরে নিবেদন করলেন, হুযূর! চাকরীর ব্যাপার, আজকে পৌঁছানো আবশ্যক ছিল। ইতোমধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। হযরত সাহেব বললেন, সময়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। আপনি এখনিই চলে যান অবশ্যই পৌঁছে যাবেন,

ইনশাআল্লাহ্। মুফতী সাহেব বাটালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন আর আমিও তার সাথে বাটালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ৪টা বেজে গিয়েছিল; সে যুগে বাটালা থেকে লাহোরের উদ্দেশ্যে দুপুর দু'টার সময় গাড়ি ছেড়ে যেতো। সবাই হতাশ ছিল কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে জানতে পারলাম গাড়ি দুই ঘন্টা বিলম্বে ছাড়বে। গাড়ি আসলো আর আমরা গাড়িতে উঠে লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এটি জলসার সময়কার ঘটনা নয় বরং অন্য সময়ের ঘটনা।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল আযীয (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ চেরাগ দ্বীন সাহেব বলতেন, একবার রোববারে আমি হযরত সাহেবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করি, হুযূর! আমাকে অফিসে পৌঁছতে হতে হবে। হযরত সাহেব অধিকাংশ সময়ই অনুমতি দিয়ে দিতেন কিন্তু সেদিন অনুমতি দেন নি বরং সোমবার সকালে অনুমতি দিলেন। এখান থেকে ১১টায় গাড়িতে চড়ে ৩টায় লাহোর পৌঁছলাম এবং টমটমে বসে সাড়ে তিনটায় অফিসে উপস্থিত হলাম। (যেহেতু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশে আনুগত্য বশতঃ রয়ে গিয়েছিলেন তাই আল্লাহ্ তা'লা কেমন ব্যবহার করেছেন আর কেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে দেখুন!) আমি চেয়ারে বসা মাত্রই অফিসের একজন ক্লার্ক এসে বলল, বারটায় আপনাকে কাগজ দিয়েছিলাম, আপনি কি সেটির কাজ করেছেন? (অথচ তিনি পৌঁছেছেন বেলা ৩টায়) এরপর আরেকজন কর্মকর্তা এসে বললেন, চেরাগ দ্বীন! ১১টায় আপনি যে চিঠি দিয়েছিলেন, এটি তার উত্তর (অর্থাৎ ঐ অফিসারের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেছেন, হয়ত কেউ চিঠি নিয়ে গেছে তিনি মনে করেছেন, চেরাগ দ্বীন নিয়ে এসেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ ফিরিশতা দ্বারা কোন ভাবে কাজ করিয়েছেন)। তিনি বলেছেন, অফিসের প্রত্যেকেই ভেবেছিল, আমি অফিসে আছি। অতএব ৪টায়, সন্ধ্যার দিকে আমি অফিস থেকে বাড়িতে চলে যাই। আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এবং সাহাবীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ছিল এটি তার একটি উদাহরণ মাত্র।

হযরত মীর মাহ্দী হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর (আ.) আমাকে ডেকে নির্দেশ দেন, আমাদের অতিথিশালায় জ্বালানী নেই তুমি গ্রাম থেকে আগামী কালের জন্য জ্বালানী ক্রয় করে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফেরত আসবে, এ বলে তিনি আমাকে জ্বালানী ক্রয় করার জন্য চার টাকা প্রদান করেন। আমি দুই টাকা নিয়ে সোজা মসজিদে মুবারকের ছাদে চলে যাই। বর্তমান মিনার যা মসজিদ থেকে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে এর পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করি হে প্রভু! তোমার মসীহ্ আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যে সম্পর্কে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। আমাকে এমন এমন পথ বাতলে দেয়া হোক যেখান থেকে আমি সন্ধ্যার মধ্যে জ্বালানী নিয়ে ফেরত আসতে পারি। আমি মিনারের সামান্য উপর থেকে একটি ধ্বনী শুনতে পাই, আর আওয়াজটি ছিল "রেগেস্তান" অর্থাৎ মরুভূমি। আমি ভাবলাম আমার পায়ের ক্ষতের কারণে হয়তঃ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যেতে বারণ করেছেন। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম— হে প্রভু! অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নিকট আবেদন করেন, আমি খুড়িয়ে খুড়িয়েই চলে যাব। কিন্তু তোমার মসীহ্র নির্দেশ যেন সন্ধ্যার মধ্যে পালিত হয়। দ্বিতীয়বার উত্তর আসে এখানেই এসে যাবে। কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। আমি কৃতজ্ঞতার সেজদা করলাম এবং বললাম, যদি এভাবেই মসীহ্র কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে তো সমস্ত পৃথিবীর জয় হবে। আমি সেখানেই বসে পড়লাম এবং দোয়া করতে আরম্ভ করলাম হে আমার প্রভু! সন্ধ্যার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট লজ্জিত যেন হতে না হয়। অতঃপর হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হল, আমি কোন নবী বা ওলী নই যার ইলহাম এত দ্রুত পূর্ণ হবে। বরং আমার কোথাও যাওয়া উচিত। পুনরায় মনে হল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয় যে, রাতে আমাদের

বাড়িতে খাবার খাবে তাহলে সে দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত হয় না তাই আমারও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি ভরসা করা উচিত। তিনি অবশ্যই এখানে জ্বালানী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি এতে প্রশান্ত হয়ে মসজিদের ছাদেই বসে থাকি। দুপুর ঘনিয়ে আসছিল। আমি নিচে নেমে আসতেই যে খাদেমার (আয়া) সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে জ্বালানী আনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন সে আমাকে দেখে বলে, তুমি এখনো জ্বালানী আনতে যাও নি। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে মনে করলাম, সে যেহেতু হুযুরের নিকট অবস্থান করে তাই সে অবশ্যই জানে যে, হুযুরের উপর ইলহামও হয় আবার তা পূর্ণতাও যায়। আমি বললাম দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। খোদা তা'লা আমাকে ইলহাম দ্বারা জানিয়েছেন, জ্বালানী এখানেই পৌঁছে যাবে। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। দেখ! আমি এখনই হযরত সাহেবের নিকট গিয়ে বলছি। সে এ কথাকে অন্যভাবে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সেখানে পৌঁছে যাবে। সে অর্থ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমি তাকে বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও সে হুযুরকে গিয়ে বলে দেয় যে, সে বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমার দুঃশ্চিন্তা হল, এখন হুযুর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন আর আমাকে নিজের ইলহামের বর্ণনা দিতে হবে। একজন ভিক্ষুক বাদশাহ্‌র সম্মুখে কীভাবে বলতে পারে যে, আমিও সম্পদশালী। {অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তো সবসময়ই ইলহাম হয়। আমি কীভাবে বলব যে, আমার প্রতিও ইলহাম হয়েছে।} এ কারণে আমি মসজিদের সিড়ি দিয়ে নেমে বাটালার দিকে যাবার দরজার পানে ছুটলাম। আর পিছন ফিরে দেখছিলাম কেউ আমাকে ডাকছে না তো। বাটালা যাবার দরজার নিকট পৌঁছে আমি স্থির করলাম সিখওয়া গিয়ে মৌলভী ইমাম উদ্দীন ও খায়র উদ্দীন সাহেবের সহযোগিতায় জ্বালানী খুঁজবো। কিছুদুর যাবার পর আমার পুনরায় মনে হল, খোদা তা'লা বলেছেন জ্বালানী এখানেই আসবে। যদি আমি বাহিরে চলে যাই তাহলে কীভাবে কাজ হবে কেননা টাকাও আমার কাছে। এ কারণে আমি পুনরায় ফেরত এসে মসজিদের ছাদে বসে দোয়া করতে থাকি— খোদার কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ হয়। হযরত আকদাসের পিরাঁ দিত্তা নামক একজন কর্মচারী যাকে পাহাড়ীয়া বলা হতো সে আমাকে দেখে ডাক দিয়ে বলল, বালান অর্থাৎ জ্বালানীর গাড়ি পাহাড়ী দরজার নিকট পৌঁছেছে তাড়াতাড়ি এসে কিনে নাও। আমি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করে তার সাথে গিয়ে দেখি জ্বালানী বোঝাই একটি বাহন পাহাড়ী দরজায় এসেছে, গিয়ে দেখি একটি পুটলি ছিল গোবরের জ্বালানীর বাকী সব ছিল লাকড়ির আর তা ক্রয়ের জন্য ১২জন ক্রেতা একজন আরেকজনের তুলনায় দুই আনা দুই আনা করে বাড়িয়ে দর-দাম হাঁকছিল। এভাবে এক টাকা বার আনা পর্যন্ত মূল্য পৌঁছে যায়। নাজিম উদ্দীন সাহেব দুই টাকা দিয়ে নিতে চাইলেন। আমি হাঁক দিয়ে বললাম, আগে দেখে নেই এখানে কত টাকার জ্বালানী আছে। এরপর গাড়ীর দিকে ফিরে বললাম এখানে একটাকা বার আনার চেয়ে এক পয়সারও বেশী জ্বালানী নেই। এটি লাকড়ি গোবরের জ্বালানী নয়— যার খুশি সে কিনে নিক। এটা বলে আমি চলে আসলাম আর মনে মনে বললাম, হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আমার পক্ষে এটি পাওয়া সম্ভব নয়। আমার চলে আসার পর একে একে সকল ক্রেতা চলে যায় কেবল পিরাঁ দিত্তা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি ক্রয় করার কেউ নেই দেখে লাকড়ীওয়ালা আশ্চর্য হয়। পিরাঁ দিত্তা তাকে বলল, গাড়ি নিয়ে আমার সাথে চল আমি তোমাকে একটাকা বারআনায় কাঠ বিক্রি করে দিব। বাহক তার সাথে যখন আসলো তখন আমি মসজিদে মুবারকে দোয়ারত ছিলাম। শুনতে পেলাম পিরাঁ দিত্তা ডেকে বলছে, জ্বালানীর গাড়ি এসেছে এটি সামলাও। জ্বালানীর

গাড়ী অতিথিশালায় পৌঁছে দিয়ে আমি মনে করলাম হযরত সাহেবকে অবহিত করি যে, আপনার নির্দেশ অনুসারে কাজ হয়ে গেছে। আবার ভাবলাম এই সামান্য কাজের জন্য কি আর সংবাদ দিব। আমার সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। খোদা স্বয়ং হযরত সাহেবকে অবহিত করবেন। সকালবেলা হযরত আকদাস প্রাতঃভ্রমনে বের হন। খালের দিকে আমার পিতার প্রস্তুত করা রাস্তার পথে ফেরত আসার সময় কৌতুকের ছলে বলেন এখানে কি মেহেদি হাসান এসেছে? আমি তাকে জ্বালানী আনার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সে বলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ইলহাম না হবে (যেভাবে সেই মহিলা গিয়ে শুনিয়েছে) আমি এ কাজ করতে যাব না। এ ঘটনা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠেন। কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার দেখুন! তার (অর্থাৎ মহেদী হাসানের) কিছু অপরাগতা ছিল আর আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়ার ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তার দোয়া কবুল হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হযরত গোলাম রসূল রাযেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদা দারুল আমানেই অবস্থান করছিলাম খুব সম্ভব ১৯০৫ সালের ঘটনা। কপুরথলার মিয়াঁ আব্দুল হামীদ খাঁন সাহেব যিনি খাঁন সাহেব মিয়াঁ মুহাম্মদ খাঁন সাহেবের বড় ছেলে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন সেই মিয়াঁ মুহাম্মদ খান সাহেব যার কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক ইযালায়ে আওহামে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল হামীদ খাঁন সাহেব আমাকে বলেন, আপনি পঠনপাঠন ও তবলীগের জন্য আমার সাথে কিছু দিন কপুরথলায় এসে অবস্থান করুন। আমি বললাম, দারুল আমানেই অবস্থান করব আর যদি যেতেই হয় তাহলে মাতৃভূমিতে ফেরত যাব। তিনি বলেন, যদি আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট আবেদন করে অনুমোদন নিয়ে নেই তবুও কি আপনি যাবেন না। এমন ক্ষেত্রে কীভাবে আমি অস্বীকৃতি জানাতে পারি। তখন অবশ্যই আমাকে যেতে হবে। অতএব তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট লিখিত দেন যে, মৌলভী গোলাম রসূল রাযেকী সাহেবকে আমার সাথে কুপুরথলা গিয়ে সেখানে তালীম-তরবীয়ত ও তবলীগের জন্য কিছুদিন অবস্থানের নির্দেশনা দেয়া হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ আবেদনের প্রেক্ষিতে মৌখীকভাবে বলেন, আমার পক্ষ থেকে তার সেখানে যাবার অনুমতি রয়েছে। অতঃপর আমি তার সাথে কপুরথলা যাই এবং সেখানে ছিনিয়ার নিকট দরস ও তবলীগের কাজ আরম্ভ করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কাজের জন্য জীবনের প্রথম সফর করার সুযোগ আমার লাভ হয়েছে।

হযরত মিয়াঁ খায়র উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, করম দ্বীন সংক্রান্ত মামলা চলাকালে আমি গুরুদাসপুওে ছিলাম। মাগরীবের সময় ছিল হুযূর বলেন, ডেস্কা নিবাসী ফিরোজ উদ্দীন সাহেব আসেন নি? তার সকালে সাক্ষ্য প্রদানের কথা ছিল। তিনি আহমদী ছিলেন না তবে আন্তরিক ছিলেন। এরপর হুযূর মৌলভী সাহেবকে বলেন, এমন কোন ব্যক্তিকে ডাকো যে মৌলভী নূর আহমদ লোধী নাংগালওয়ালাকে চেনে। আমি উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হুযূর! আমি তাকে চিনি। হুযূর বলেন, এখনই যাও এবং আগামীকাল ন'টার পূর্বে তাকে সাথে নিয়ে আসো। আমি রাতারাতি পৌঁছে গেলাম আর কিছু সময় ক্ষেতে পানি সেচের জন্য যে নালা হয়ে থাকে এমন একটি নালার পাশে বসে বিশ্রাম নিলাম এবং ভোরে গ্রামে পৌঁছলাম। মৌলভী সাহেব নামাযের পর ছাত্রদেরকে পাঠদান করছিলেন। আমাকে দেখে দূর থেকেই কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন আগমনের উদ্দেশ্য কী? আমি বললাম, হুযূর আপনাকে স্মরণ করেছেন তাই গুরুদাসপুর থেকে এসেছি। মৌলভী সাহেব তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করে দিলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করেন, يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায় (সূরা আল আনফাল:২৫)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ঘরেও যান নি বরং সোজা আমার সাথে হাঁটা ধরলেন এবং ন'টার কাছাকাছি সময় আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

জম্মু নিবাসী হযরত খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) বলেন, শহর পরিদর্শনের দিনগুলোতে যেখানেই যেতাম বিভিন্ন কবর সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের কাছে এবং প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতাম আর অনেক সময় এসব ব্যাপারে হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালকেও বলতাম। একবার আমি খাঁন ইয়ার মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটি কবরের পাশে এক বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধ মহিলাকে বসা দেখলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার কবর? তারা বললেন, নবী সাহেবের। আর এটি যুবরাজ নবী এবং পয়গম্বর ইউয আসফ সাহেবের কবর বলে প্রসিদ্ধ। আমি বললাম, এখানে নবী কোথা থেকে এসেছে? তারা বলল, এ নবী অনেক দূর থেকে এসেছিলেন এবং কয়েক শত বছর পূর্বে এসেছিলেন। মোটকথা তারা বলল যে মূল কবরটি নিচে। এতে একটি ছিদ্র ছিল সেখান থেকে সুগন্ধ আসতো কিন্তু একবার বন্যার পানি আসার কারণে এ সুগন্ধ আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি হযরত মৌলভী সাহেবের কাছে এর উল্লেখ করলাম। অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের কাছে। এ ঘটনার পর এক দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মৌলভী সাহেব যখন চাকরী ছেড়ে কাদিয়ান চলে গেলেন তখন একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে হযরত মৌলভী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ —(সূরা আল্ মুমেনূন:৫১) এ আয়াত দ্বারা আমি মনে করি, ক্রুশের ঘটনার পর হযরত ঈসা (আ.) কাশ্মীর সদৃশ কোন একটি জায়গায় গিয়ে থাকবেন। তখন খাঁন ইয়ারের কবর সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল আমার বর্ণনার উল্লেখ করলেন। হুযূর আমাকে ডাকলেন এবং এ ব্যাপারে আমাকে আরো গবেষণা করার নির্দেশ দিলেন। অতএব আমি উক্ত কবর সম্পর্কে আরো গবেষণা করে এবং কাশ্মীর ঘুরে ঘুরে ৫৬০জন উলামার কাছ থেকে দস্তখত সংগ্রহ করে হুযূরের সমীপে পেশ করলাম যা হুযূর খুবই পছন্দ করেছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ তাজ হোসেন বোখারী সাহেব (রা.) বলেন, যখন হযরত সাহেব শিয়ালকোটে মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন তখন আমি আমার নানাজান হযরত সৈয়্যদ আমীর আলী শাহ্ সাহেবের মাধ্যমে তাঁর সমীপে উপস্থিত হলাম। হুযূর বয়আত নিলেন এবং বললেন, কাদিয়ান এসে পড়ালেখা কর। তুমি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে অথবা ওলীদের মাথার মুকুট হবে। অতএব আমি ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং প্রায়শঃ হযরত আকদাসের খিদমতে উপস্থিত থাকতাম আর কয়েকবার ভ্রমণেও সাথে গিয়েছি।

হযরত মিয়াঁ সোনে খাঁন সাহেব (রা.) বলেন, ১৮৯৯ সালে বাটালা জায়গীরে বন্দোবস্ত বিভাগে এই অধম চাকুরী পায়। ভূমি সীমা নির্ধারণের কাজ করছিলাম আমি। শেখ হাশেম আলী সানওয়ারী নিম্নশ্রেণীর ভূমিরাজস্ব পরিদর্শক ছিলেন, তিনি পরিদর্শনে আসেন আর কাজ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন। তিনি বর্ণনা করেন, তোমাদের এখান থেকে কাদিয়ানের দূরত্ব কত? আমি নিবেদন করলাম, ত্রিশ ক্রোশ। শেখ সাহেব বললেন, আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সেবক। আমি উত্তর দিলাম, এক মির্যা সাহেব মেথরদের পীর সেজেছে (নাউযুবিল্লাহ্) ঈসা হয়ে গেছে।

(নাউযুবিল্লাহ্) আরও সম্পদ জড়ো করছেন। হাট গ্রামে একজন বুযূর্গ ওলী আল্লাহ্‌র মাযার ছিল তার নাম ফতেহ আলী শাহ্। স্বপ্নে এই বুযূর্গের মাযারে আমি জনাব মসীহ্ মওউদকে দেখেছি। আমি মসীহ্ মওউদকে পশমের চাদর বিছিয়ে দেই। হযরত সাহেব উপরে বসেন। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম (তিনি তার স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছিলেন) আর সেবা করে যাচ্ছিলাম। লাগতার এক মাস এই অবস্থা চলছিল। এরপর আমার স্বপ্নে সেই কবরে সমাহিত ব্যক্তি শাহ্ ফতেহ আলী সাহেব আসলেন আর বললেন, কাদিয়ানে যুগ ইমামের জন্ম হয়েছে। আমি নিবেদন করলাম, মির্যা গোলাম আহমদ! এই বুযূর্গ বললেন, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। আমি সাধারণ কোন স্বপ্ন মনে করে নিরব থাকি। অল্প কিছুদিন পরই আমার স্বপ্নের বুযূর্গ আবার আসেন আর বলেন, তুমি কাদিয়ান কেন যাও নি? কেন বয়আত কর নি? দ্রুত গিয়ে বয়আত কর। আমি সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছুটি নিয়ে ঘরে আসি। কিছু পারিবারিক বিষয়ের কারণে আমার বিলম্ব হয়ে যায়। সেই ওলী আবার স্বপ্নে সাক্ষাত করে বলেন, আমরা তোমাকে ঘরে বসে থাকতে বলি নি। তুমি দ্রুত কাদিয়ান গিয়ে বয়আত নাও। সেদিন অধম ঘর থেকে রওয়ানা হয়ে রাসগো গ্রামে রাত্রি যাপন করে। এখানে আমার আত্মীয় ছিলেন তিনি বলেন, পৌষ মাসের পরে যাবে। আমি তার কথা মেনে নেই। রাতে স্বপ্নে ফতেহ্ আলী সাহেব আবার আসেন আর বলেন, পনের ক্রোশ তো এসেই গেছ আর মাত্র সতের ক্রোশ বাকি আছে। আমরা তোমার সাথে আছি, তোমার কিসের ভয়? আবার ভোরে রওয়ানা হলাম। কাদিয়ান পৌঁছে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক লোক পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ব দিকে ভ্রমণে গেলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা জঙ্গলে কেন একত্রিত হয়েছে? তারা বলল, মির্যা সাহেব ভ্রমণে যাচ্ছেন, তাঁর সাথে তারাও যাচ্ছে। আমিও লোকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম আর হযরত সাহেবকে আসসালামু আলাইকুম বলে করমর্দন করলাম। মির্যা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছ? বললাম, হুশিয়ারপুর জেলার মাড্ডিয়ানা গ্রাম থেকে এসেছি। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি নিবেদন করলাম, সোনে খাঁন। বললেন, তুমি ঐ সোনে খাঁন, যে স্বপ্ন দেখেছে। মনে হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তার বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি নিবেদন করলাম, আমি আপনার সে দাসই। বললেন, তিন দিন অবস্থান কর। তিনদিন পর বয়আত নিব। তিনদিন পর বয়আত করি। বললেন, পূর্বের মসীহ্ নাসেরীর হাতেও গরীবরাই বয়আত করত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বক্তব্য- "অনেক গরীব, মেথর ও চামাররা তাঁর হাতে বয়আত করছে, সে মসীহ্ হয়ে গেছে" এর প্রেক্ষিতে এই উত্তর দিলেন। তিনি নিজে এটি বলেন নি। অথবা হতে পারে সংবাদটা পূর্বেই তাঁর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। গরীব লোকেরাই পূর্বের মসীহ্‌র হাতে বয়আত করেছিলেন। আর আমার বয়আতও প্রথমে গরীবরাই নিচ্ছেন। এরপর আমাকে বললেন, আমাকে সত্যবাদী জানবে। যেসব উপদেশ দিলেন তার একটা ছিল, আমার সত্যতার বিষয়ে পূর্ণ ঈমান রাখবে। দ্বিতীয়ত পাঁচ বেলা নামায পড়বে। আর তৃতীয় বিষয় হল, কখনো মিথ্যা বলবে না। আর একথা বলে আমাকে ফেরত যাবার অনুমতি দিলেন। এই তিনটি উপদেশ প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক।

মোহাম্মদ বখ্‌শ সাহেবের পুত্র হযরত ফযলে ইলাহী সাহেব (রা.) বলেন, একবারকার ঘটনা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও হযরত আম্মাজান একদিন ভ্রমণ করতে করতে আমাদের গ্রামে আসেন। ফেরত যাবার সময় বললেন, পানি পান করাও। হযরত আম্মাজানের পিপাসা লেগেছে। (এটি হযরত আম্মাজানের আনুগত্য সংক্রান্ত ছোট্ট একটি ঘটনা) আমার মা গ্লাসে পানি ঢেলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে যাও। আমি দ্রুত তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। আম্মাজান

ও হযরত সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি আম্মাজানকে পানি দিলাম। তিনি গ্লাস ধরে পান করা শুরু করলেন। হযরত সাহেব শুধু বললেন, পানি বসে পান করা উচিত। আম্মাজান শুধু এক ঢোক পানি পান করেছিলেন। একথা শুনে তিনি সাথে সাথে বসে গেলেন এবং বাকী পানি বসে পান করলেন।

হযরত নিযাম উদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবারের ঘটনা। ঐ যুগের রীতি অনুসারে প্রথমে সব সকল অতিথি গোল কামরায় একত্রিত হতেন। হযরত আকদাসকে জানানো হত যে, হুযুর! সেবকগণ উপস্থিত। একদিন হযরত আকদাস পূর্বেই চলে আসেন। হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.) তখনো আসেন নি। আমাকে হুযুর বললেন, যাও মৌলভী সাহেবকে ডেকে আন। আমি দৌঁড়ে চিকিৎসালয়ে যাই এবং হযরত আকদাস তাঁকে ডেকেছেন বলে জানালাম। হযরত নূর উদ্দীন সাহেব বললেন, হযরত সাহেব চলে এসেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আরো বললাম, তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি ডাক্তারখানা থেকে দৌঁড়ে বের হন এবং দৌঁড়ে গোল কামরায় পৌঁছেন। বৈঠকে হযরত খলীফা আউয়াল সাধারণত মাথা নত করে বসে থাকতেন। কেবল হযরত আকদাস তাকে সম্বোধন করলে মাথা তুলতেন। নয়ত দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাথা নত করে বসে থাকতেন।

হযরত হাফিয জামাল আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, মরহুম মৌলভী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে রাত এগার বা বারটার সময় কেউ একজন হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর ঘরে দুধ চাইতে আসল। মৌলভী সাহেব বললেন, আমার ঘরে তো এখন দুধ নেই কিন্ত যত টাকাই লাগুক না যেখান থেকেই হোক, এখনই দুধের ব্যবস্থা কর। হযরত সাহেবের লোক খালি হাতে ফেরত যাক তা আমি চাইনা। {হয়ত কোন অতিথি এসেছে, তার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দুধ চেয়ে পাঠিয়েছেন)। আমি দৌঁড়ে এসে অতিথিশালার সামনে যে ঘর আছে, সেখানকার একজনকে জাগালাম। সে মহিষের দুধ দোহনের চেষ্টা করল এবং খোদার ফযলে দুধ পাওয়া গেল। (সাধারণত সন্ধ্যায় লোকেরা মহিষের দুধ দোহন করে নিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাতে পুনরায় দোহনের পর দুধ বেরিয়ে আসল। মৌলভী সাহেব এতে খুবই আনন্দিত হলেন।

হযরত হাফিয জামাল আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, মরহুম মৌলভী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বর্ননা করেন, একবার বাটালার এক সাহেব, আমি তার নাম ভূলে গিয়েছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনুমতিক্রমে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-কে তার একটি রোগের চিকিৎসার জন্য বাটালা নিয়ে যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! সন্ধ্যার মধ্যেই আপনি ফিরে আসবেন। মৌলভী সাহেব বললেন, জী হুযূর! এসে পড়ব। খোদার মহিমা দেখুন! বাটালা পৌঁছানোর পর এমন বৃষ্টি হল যে, সর্বত্র পানিতে ডুবে গেল। সে অবস্থায় সন্ধ্যায় মৌলভী সাহেব কাদিয়ান পৌঁছে যান। হাটু পানিতে হাঁটতে হয়েছে। পায়ে কাঁটাও বিঁধেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, মৌলভী সাহেব! আমার কথার অর্থ এটি ছিল না। আপনি কেন এত কষ্ট করতে গেলেন।

মোগল সাহেব হিসেবে পরিচিত হযরত আব্দুল আযীয সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব নিজের চিকিৎসালয়ে বসা ছিলেন। বেলা সম্ভবতঃ ১২টা অথবা ১টার দিকে, গরমকাল ছিল। হযরত উম্মুল মু'মিনীন ভেতর থেকে একজন সেবককে পাঠালেন, আর সে এসে বললো, মৌলভী সাহেব! হযরত উম্মুল মু'মিনীন বলেছেন, এসে আমার রগ খুলে

দিন। তিনি বললেন, আম্মাকে গিয়ে বল, এই রোগের সময় চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে রগকাটা নিষিদ্ধ। কিছুক্ষণ পর সে আবার ভেতর থেকে আসে আর একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। হযরত মৌলভী সাহেবও একই উত্তর দেন। কিছুক্ষণ পর হযরত মিয়াঁ মাহমুদ আহমদ সাহেব আসেন, তাকে হযরত মৌলভী সাহেব কোলে তুলে নিলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন, মিয়াঁ সাহেব আসার উদ্দেশ্য জানতে পারি কী? বললেন, আব্বা বলছেন, এসে রগ খুলে দিতে। মৌলভী সাহেব গিয়ে সিংগা দেন। যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন গোলাম মোহাম্মদ সাহেব নামী এক ব্যক্তি বললেন, আপনি তো বলতেন, এটা নিষেধ। বললেন, এখন চিকিৎসা নয় বরং এটি নির্দেশ।

মিয়াঁ শরাফত আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর পিতা হযরত মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেব মরহুমের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি আমার পিতার খুবই ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। আর হুযূর (রা.) ও তাঁকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। হযরত মৌলভী সাহেবের মা আওয়ান গোত্রের ছিলেন। অর্থাৎ মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবের অপর দিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাও আওয়ান গোত্রের ছিলেন আর মৌলভী জালাল উদ্দীন সাহেবও ঐ গোত্রের ছিলেন। এ জন্য হযরত মৌলভী সাহেব তাকে অনেক স্নেহ করতেন। তাঁর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পক্ষ থেকে এ নির্দেশ ছিল, যখনই কাদিয়ান আসবে তখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে বসবে। এরপর আমার কাছে বসবে আর কোথাও যাবে না। এই জায়গা ছাড়া আর কোথাও তোমার যাবার অনুমতি নেই। আব্বা বলতেন, আমি এমনই করতাম। পিতা বর্ণনা করেন, একবার আমি কাদিয়ানে রমযান কাটাই।

হযরত স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব পিতা চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সে সময় চিকিৎসা ছাড়াও যা আজকাল হাকীম কুতব উদ্দীন সাহেবের চিকিৎসালয় সেখানে মৌলানা রূমীর মসনভীর দরস দিতেন। আমার পিতার সাথে ঐ দিনগুলোতে আমারও তার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হত। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, অনেক সময় এই দরসের প্রাক্কালে এমন হয়েছে, কেউ একজন এসে বলেছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাহিরে এসেছেন আর তা শোনামাত্রই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) দরস বন্ধ করে উঠে দাঁড়াতেন। আর চলতে চলতে পাগড়ি বাঁধতেন আর জুতা পরার চেষ্টা করতেন। এই প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ই তার জুতার গোড়ালীর অংশ ক্ষয় হয়ে যেত। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে উপস্থিত হতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর তাঁকে সম্বোধন না করতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি হুযূর (আ.)-এর পবিত্র চেহারার দিকে মুখ তুলে তাকাতেন না।

হযরত সুফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর ঘটনার লেখকগণ লিখেছেন, সবাই মৌলভী নূর উদ্দীন (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন। আর মৌলভী সাহেব বলেন, গতকাল আমি তোমাদের ভাই ছিলাম। আজ আমি তোমাদের পিতা হয়ে গেলাম। তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে হবে। আমাতুল হাফিয হুযূরের সন্তানদের মধ্যে সবচে' ছোট ছিলেন, যদি আমাতুল হাফিযের হাতেও বয়আত করা হত তাহলে আমি তারও ঠিক তেমনই আনুগত্য করতাম যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আনুগত্য ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা সেই সমস্ত সাহাবীর (রা.) পদমর্যাদা উন্নত থেকে উন্নতর করুন আর তাঁদের মনবাসনানুসারে পরকালেও তাঁরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথী হতে পারেন। এই ইচ্ছাও যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাঁদের বংশধরদেরকেও বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

রাখুন। আমাদেরকেও পুরো আনুগত্যের সাথে এ যুগের ইমামের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করার তৌফীক দান করুন। তিনি (আ.) তাঁর নিষ্ঠাবানদের জন্য দোয়া করেছেন আমরা যেন তারও উত্তরাধিকারী হতে পারি আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর উক্তি যা আমি পাঠ করে শুনিয়েছি তদনুসারে তাঁর (আ.) পরে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় কুদরতের সাথেও যেন বিশ্বস্ততা, ভালবাসা এবং আনুগত্যের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি; অর্থাৎ আমাদেরকে পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। যে এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারীও হতে চায় তাকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ জামাতের অংশ হতে হবে কেননা, এটি ছাড়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ হতেই পারে না। মহান আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

এখন জুমুআ এবং আসর এর নামায জমা করার পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথম জানাযা হচ্ছে, একজন শহীদ মরহুম মোবারক আহমদ সাহেবর পুত্র মুকাররম তারেক আহমদ সাহেবের। 'লাইয়া'র একটি গ্রামে তার জন্ম। তারেক সাহেবের জন্মের দু'মাস পূর্বেই তার পিতা মোবারক আহমদ সাহেবের মৃত্যু হয়। মুকাররম তারেক সাহেবের বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ২০১২ সনের ১৭ই মে তারেক সাহেব বাজার-সদায় করার আর ব্যবসায়ীদের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য লাইয়া জেলার কারূডে যান। সেখান থেকে আসার পূর্বে আনুমানিক ৪ টার দিকে ঘরে ফোন করে বলেন, সবজি ও অন্যান্য বাজার করেছি অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি না? এরপর থেকে তার সাথে আর কোন যোগাযোগ হয়নি। রাত পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসেন নি। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় কিন্তু কোনভাবেই যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে জানা যায়, ফিরতি পথে অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন তাকে অপহরণ করে অজানা নিয়ে যায়। তার হাত পা বাঁধা অবস্থায় ছিল তার উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের ভয়াবহতা এমনই ছিল যে, মরহুমের একটি পা ভেঙ্গে ফেলা হয়, কাধের একপাশ এবং পাজরও গুড়িয়ে দেয়া হয়। দু'হাটুতেই তারকাটা ফোটানোর চিহ্ন ছিল। চোখেও গভীর আঘাতের ছাপ ছিল। মাথাতেও চরম নিষ্ঠুরতার আঘাত ছিল আর নিষ্ঠুরতার পরও মাথায় গুলি করে তাকে শহীদ করে,إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

এরপর এ অবস্থাতেও তার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে এবং চরম বর্বরতা চালায়। মৃত্যুর পূর্বেও তা করা হয়েছিল। অতঃপর একটি ড্রামে ভরে রাজান শাহ্র নদীতে ফেলে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে নদীর মুখে বাঁধ ছিল তা না হলে নদীতে লাশের কোন খবরই পাওয়া যেত না। পরের দিন পুলিশ জানিয়েছে যে, লাশ পাওয়া গেছে কিন্তু আঘাতের কারণে চেহারা এতটাই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে যে, আত্মীয়-স্বজনরা শনাক্ত করতে পারছিলেন না। চেহারা অনেক বেশি খারাপ এবং বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল। কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য চিহ্নের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনরা তাকে শনাক্ত করেন।

আমীর সাহেবের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এটি জামাতী বিরোধিতার কারণে হয়নি। কিন্তু আমার ধারণা— জামাতের বিরোধিতার কারণেই এমনটি ঘটেছে। কেননা পূর্বেও বিরোধিতা হয়েছে। যেহেতু তিনি ভদ্র মানুষ ছিলেন। কারো সাথে তার এমন কোন লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল না। এছাড়া তার কোন আত্মীয়কেও কিছুদিন পূর্বে গুলি করে এমনিভাবে আহত করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর এই শত্রুদেরকেও দ্রুত দৃষ্টান্তমুলক নিদর্শনে পরিণত করুন। আর আহমদীয়াতের সত্যতার পক্ষে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রকাশ করুন আর অচিরেই তা প্রকাশ করেন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন! এমন অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিদর্শন যাচনা না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সফলতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না যার অঙ্গীকার মহান আল্লাহ্ তা'লা করেছেন। সাধারণত যে সফলতা নিদর্শনের পর লাভ হয়– তা এমন এক সুস্পষ্ট সফলতা বলে গণ্য হয় যা শত্রুদেরও দৃষ্টিতে পরে আর এরই ফলশ্রুতিতে শত্রু সত্যকে গ্রহণ করে। যখন আমরা পরম বিনয়ের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সমর্পণকারী হব তখনই একটি অলৌকিক সফলতা লাভ হবে। দোয়া প্রার্থনাকারী হব আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

মরহুম শহীদের ভাই আরেফ আহমদ গিল সাহেব সিলসিলাহ্র মুরব্বী তিনিও মরহুমের অনেক গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন, সবাইকে ভালবাসতেন। মরহুমের স্ত্রী ছাড়াও ছয় ছেলে এবং দু'জন কন্যা রয়েছে। বড় ছেলের বয়স ১৮ বছর আর সবচেয়ে ছোট সন্তানের বয়স দুই বছর। অন্য সবার বয়স এদের মাঝামাঝি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও স্বীয় সুরক্ষায় আশ্রিত রাখুন।

দ্বিতীয় আরেকটি জানাযা হচ্ছে, রাবওয়া নিবাসী মুকাররমা আমাতুল কাঈউম সাহেবার। তিনি শেখ আব্দুস সালাম সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ৩রা মে ২০১২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি রাবওয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন বাসিন্দাদের একজন ছিলেন। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন। তার তিন কন্যা এবং পাঁচজন ছেলে রয়েছে। এখানে (জার্মানীতে) তার এক ছেলে রয়েছে যার নাম আব্দুর রাফে সাহেব। একইভাবে হল্যান্ডেও এক ছেলে রয়েছে আর অন্য একজন আছেন রাবওয়াতে। তার মেয়ের ঘরের দুজন নাতী যুক্তরাজ্যের জামেয়াতে অধ্যায়নরত আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)